করোনার কালের কাহন

দিলরুবা শাহানা

করোনা গিয়ার ও জুম অ্যাটায়্যার

কদিন বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ উঠেছে। চারপাশ শুনশান। সব বাড়ীর সামনে সবার গাড়িই নিশ্চল দাড়িয়ে। কেউ একজন সূর্যের ভিটামিন ডি গায়ে লাগাতে বাইরে এলেন। গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতে গিয়েই জরুরী কথাটা মনে পড়লো। গিয়ার ছাড়া এভাবে রাস্তায় চলে গেলে পুলিশে ধরতে পারতো। আর করোনার গিয়ার ভুলে যাওয়া ভয়ংকর বিষয়। প্রথমতঃ পুলিশ যদি ধরে তবে দু'শ ডলার ফাইন গুণতে হবে। দ্বিতীয়ত করোনা গিয়ার অর্থাৎ মাস্ক না পরে গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরাঘুরি করলে করোনার বেশে মৃত্যুদূত আলিংগন করতে পারে। তাই সখের স্পোর্টস গিয়ার, হান্টিং গিয়ার যেমন আছে তেমনি আজকের বাস্তবতায় আছে করোনা গিয়ার বা মাস্ক। সখের নয়, স্বস্থির নয় বরং বিরক্তিকর এক লেবাস বা গিয়ার হচ্ছে মাস্ক। উপায় কি পরতেই হবে মাস্ক। দেশে দেশে করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে মাস্ক বা মুখোশ পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । সরকারী প্রশাসন পুলিশ গলদঘর্ম হচ্ছে মানুষকে মাস্ক পরার সবক দিতে দিতে। আর মাস্ক পরা নিয়ে কিছু মানুষের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পাগলের মত। এমন কি মাস্ক পরার জন্য বলতে গিয়ে পুলিশকে উত্তমমধ্যম পর্যন্ত খেতে হয়েছে। ঘটনা মেলবোর্ন শহরেরই। জুলাই ৮, ২০২০ থেকে যখন অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেটে লক ডাউন শুরু হল তখন মেলবোর্নের ফ্রাংকস্টোনে মাস্ক পরার কথা বলাতে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারকে আরেক মহিলা চুলের ঝুটি ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছিল। টিভিতে খবরটা বেশ গুরুত্বসহ প্রচার করা হয়েছিল।

গায়ের জোরে করোনা গিয়ার না পরে, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কোন লাভ হয়নি। মানুষ রেহাই পায়নি। ভিক্টোরিয়াতে জুলাই মাসেই হু হু করে সংক্রমণের হার বাড়তে শুরু করলো। সরকারী পরিসংখ্যানে জানা যায় সে সময়ে দৈনিক সংক্রমণের হার ৭০০এর উপরে চলে গিয়েছিল। তারপরই লকডাউন আরও শক্তপোক্ত করা হল। মেলবোর্নের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে অফিস আদালত ছয় সপ্তাহের জন্য পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাত আটটা থেকে ভোর পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ হয়েছিল শুরুতে এখন রাত নয়টা থেকে কার্ফু। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মানুষ ঘরবন্দী। করোনা গিয়ার আরও কতদিন পরতে হবে আল্লাহ মালুম! করোনা নিয়ে গান বাঁধা হয়েছে, গল্প কবিতা গাঁথা হয়েছে।

বাচ্চারাও মাস্ক চিনে গেছে। তারাও টিস্যু দিয়ে মাস্ক বানিয়ে খেলছে।

করোনার সময়ের আরেক বাস্তবতা হচ্ছে জুম। অফিস আদালতে যাওয়া সম্ভব না। তাই লোকজন ঘরে বসে ইন্টারনেটের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে । বলা হচ্ছে করোনা মানুষের জীবনই শুধু কেড়ে নিচ্ছে না জীবিকাও কেড়ে নিচ্ছে । তবে কিছু মানুষ এখনো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টেবিলে বসে ল্যাপটপ, আইপ্যাডে অফিসের কাজ করেই যাচ্ছেন, কাজ না করলে ব্যক্তি জীবিকা হারাবে আর জাতির অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে ও যাচ্ছে। যদি আজ থেকে পনেরো/বিশ বছর আগে যখন ইন্টারনেটের যোগাযোগ এমন সর্বব্যাপী ছিল না তখন করোনা হানা দিয়ে মানুষকে ঘরবন্দী করলে কি হতো?

ইন্টারনেটের বদৌলতে আজ মানে ২০২০এ কর্মিরা ও কর্তারা আলাপ-আলোচনা, মিটিং ইত্যাদি করছেন জুমে। নিজের ঘরে বসে চা বা কফির কাপ হাতে পরস্পরের চেহারা দেখে জুম বা ওয়েবেক্সে কথাবার্তা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, নীতি নির্ধারন সবই করা যাচ্ছে।

সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কেউ দাড়ি সেভ করে, কেউ মুখে চোখে হালকা প্রসাধনের প্রলেপ ছড়িয়ে অফিসের ধরাচুড়া পরে নাসতা খাওয়া গেল কি গেল না ছুট অফিস পাড়ায়। এখন তা করতে হয় না। সকালের নৈমিত্তিক কাজ উর্ধশ্বাসে করতে হয় না । কাপড়চোপড় পাল্টানো নেই, শার্টের সাথে মিলিয়ে টাই বাছা (স্ট্রাইপ নাকি বলপ্রিন্ট, নীল নাকি বেগুনী) ইত্যাদি কাজ করারও দরকার নেই। মোটামুটী পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরের কাপড়েই কাজ শুরু করা যায়। তবে জুম মিটিং থাকলে একটু গুছিয়ে বসে লোকজন। নিম্নাঙ্গে রাত পোশাক থাকলেও

উপরে পরিপাটি শার্টের সাথে টাই পরেই জুম মিটিং করা যায়। চুল কাটার উপায় নেই। কারন খবরে প্রকাশ এক নাপতের দোকান বা হেয়ার ড্রেসিং সেলুন থেকে পয়তাল্লিশ জনের করোনা ছড়িয়েছে। সুতরাং চুল পরিচর্যার সব দোকান বন্ধ। খোলা থাকলেও প্রাণের ভয়ে, জানের মায়ায় কেউ সাদামাটা নাপিতের কাছে বা নামীদামী হেয়ার আর্টিস্টের কাছেও যেতো কি না সন্দেহ।

তবে জুম মিটিং এ বনবাসীর মত লম্বা লম্বা চুলদাড়ি নিয়ে হাজির হওয়া অস্বস্থিকর। তাই মাথাটা নেড়া করা উত্তম। জুম অ্যাটায়্যার হচ্ছে হাফ প্যান্ট বা শর্টসের উপরে শার্টে টাই বা বো টাই।

চুল কাটার উপায় নেই তাই মাথা নেড়া।

ইউনাইটেড আতংক

আহলানের এখনকার নিয়মিত অভ্যাস হচ্ছে সকালে ইন্টারনেটে দেশের খবর, ঢাকার খবর আর পৃথিবীর খবরে চোখটা বুলিয়ে নেওয়া। গতরাতে বোনের সাথে টেলিফোন করে অনেক বাক বিতন্ডা করেছে। বোনের শ্বশুরের হাপানী আগেই ছিল এবার জ্বর-কাশি শুরু হতেই তাকে নামীদামী হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলছে আহলান বারবার। সরকারী হাসপাতালে যাওয়া এখন তাদের মত বিত্তবান লোকদের মানায় না।

টাকা পয়সা যথেষ্ঠ হয়েছে তার, পরিবারেরও। হবে নাই বা কেন এক সময়ে মাথা নীচু করে পাছা উপরে রেখেই সারাক্ষন কাজ ছিল তার। সেই কাজ করেই এন্তার টাকার মালিক আজ আহলান। দশ পনেরো জন স্থায়ী কর্মী আর পঞ্চাশের বেশী ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়ে এখন তার মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। প্লামার হিসাবে কাজ শুরু করে এখন সে প্লামিং কোম্পানীর মালিক। সাধারন বিএসসি ডিগ্রী নিয়ে বিদেশে এসে যখন সে প্লামিং বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিতে গেল তখন পরিচিত এদেশের সাধারন মানুষ রসিকতা করে অভব্য একটি কথা বলেছিল The bigger the bam crack, the bigger the pay check। কিছুদিন যেতেই সে নিজেও অবাক তার অর্থ উপার্জনের বিপুলতা দেখে। এক সময়ে কাজটা যদিও অহংকার করে বলার মতো না ছিল না তবে তার অর্থের ঝনঝনানি ও বিত্তের চাকচিক্যে সবাই ঈর্ষান্বিত হতো। এখনতো শতেক মানুষকে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে অনেক পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে আহলান। চারপাশে সবাই তাকে রীতিমত সমীহ করে চলে।

একসময়ে অর্থাভাবে তার সবচেয়ে মেধাবী একটা ভাইয়ের চিকিৎসা করাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মারাই গিয়েছিল ভাইটা। বিদেশে এসে বিদ্যার্জন নয় সৎভাবে কাজ করে বেশী পয়সা উপার্জনই ছিল উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে পৌঁছেছে আহলান।

যাই হোক তার বোনের পরিবারের সদস্যদেরও এখন চিকিৎসা পাওয়ার কথা এ্যাপোলো আর ইউনাইটেড এর মত নামীদামী হাসপাতালে। তাকে কেন যে সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহলান সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

প্লামিং ইউনাইটেড কোম্পানীর হর্তাকর্তা সে। এমবিএ থেকে আইনজীবী, মেকানিক থেকে মেইন্টেনান্স ইঞ্জিনিয়ার সব ধরনের কর্মী পৃথিবীর নানান দেশ থেকে একত্রিত হয়েছে তার পাশে। তার কোম্পানী বড় বড় সব সংস্থার(হসপিটাল, পাঁচতারা হোটেল, বড় শপিং মল)জন্যই মূলতঃ কাজ করে তবে সাধারন মানুষের জন্যও তাদের সেবাদান বাদ যায় না। আমজনতার বাড়ীঘরের রান্নাঘরের সিংক থেকে পয়ঃনিষ্কাশনের পাইপ সারানোর দক্ষতাও তাদের জানা। উপুর হয়ে করা কাজের পয়সাও উপচে পড়ে।

বোনের জামাই ভাল চাকরি করে দেশে। বড় কথা হল লোকটি আত্মসম্মানী ও সৎ মানুষ; বিদেশে আসবে না সে। কিন্তু বাপকে একটা ভাল হাসপাতালে রাখলে কি এমন ক্ষতি হতো খোদা মালুম! তার কথা হল ডঃ জাফরুল্লাহর মত 'এদেশের সাধারন মানুষ যে চিকিৎসা পাওয়ার কথা আমার বাবাও তাই পাচ্ছেন, উনাকেতো বাদ দেওয়া হয়নি'।

গতরাতের মন খারাপ নিয়েই দিনের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল। খবরটা দেখেই সে চমকে উঠলো। এমন নামী হসপিটালে এমন গাফিলতি ভাবা যায়! সাতজন রোগী ইউনাইটেড হসপিটালে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। একজন ডাক্তার বা নার্স, নিদেন পক্ষে একজন আয়া-বুয়াও আগুনে পুড়ে মরলো না! মরলো শুধু করোনা সন্দেহে ভর্তি সাতজন মানুষ। কি যে দারুন বাঁচা বেঁচে গেছে আহলানের বোনের শ্বশুর। যদি টাকার ক্ষমতার জোরে তাকে ইউনাইটেড হসপিটালে গতকাল বিকালে ভর্তি করা হতো তবেতো গতকাল রাতেই তাকেও আগুনে পুড়ে মরতে হতো। নয় কি?

রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করলো আহলানের। চিকিৎসার নামে যারা মানুষ মারার ফাঁদ পাতে, মানুষকে নিংড়ে অর্থ আদায় করার মতলব আটে তাদের কি করা উচিত জানা নাই। এইরকম কান্ড আগেও হয়েছে জানে তবে তার কি কোন বিচার বা সুরাহা হয়েছিল? ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ের ডায়রিয়ায় আক্রান্ত স্বনামধন্য সঙ্গীত গবেষক শিক্ষক মৃদুল কান্তি চক্রবর্তীর পরিবার ঢাকার ল্যাবএ্যাইড নামে হসপিটালের ভর্তির পুরো টাকা তক্ষুণি জমা দিতে পারেননি বলে এ্যাডমিশন লাউঞ্জেই তার মৃত্যু হয়। এর জন্য কি খেসারত ওই হসপিটাল দিয়েছিল তা আহলানের জানা নাই বা জানতে চেষ্টাও করে নি। আহলান কাগজে খবরটা আবার পড়লো। এখন অতিমারি করোনার সময়ে ডাক্তার-নার্স, সাফাই কর্মী জান লুটিয়ে, প্রাণ বাজী রেখে কাজ করছে আর লাভের টাকা পকেটে পুরছে কর্পোরেটের কু···।

ইউনাইটেড হসপিটালে আগুনে পুড়ে মৃত একজনের কথা পড়ে তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো। বয়স ৪৩/৪৫ বছর ভদ্রলোক এক বাচ্চার বাবা। ওই দিনই বিকাল তিনটায় ইউনাইটেড হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল আর রাত সাড়ে নয়টায় আগুনে পুড়ে মারা যায়। করোনা ওয়ার্ডের নামে এক হাজতখানায় বন্দী অবস্থায় সাত সাত জন মানুষ নিমেষে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। হসপিটাল তৈরীর উদ্দেশ্য এখন মানব সেবা, মানুষের মঙ্গল নয়। হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে কর্পোরেটের মুনাফা অর্জনের বিশাল কারখানা হিসাবে। রোগীরা হচ্ছে সব শিকার। ঝাপটে ধরে আর··· করে।

আহলান এখন বোনকে ফোন করবে। প্রথমতঃ তার শ্বশুরকে নামী হসপিটাল ইউনাইটেডে ভর্তি করার জন্য বোনকে জোড়াজুড়ি করেছিল বলে বোনের কাছে মাপ চাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ওই হসপিটালের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হয়েছে কিনা খবর জানতে চেষ্টা করবে। কর্তব্যে কি নিদারুন অবহেলা, অবহেলিত রোগী একজন নয় সাত সাতজন আগুনে পুড়ে মরলো।

করোনার সময়ে তার কাজকর্ম বন্ধ হলেও এই দেশের সরকার ব্যবসা টিকিয়ে রেখে মানুষের কাজ বাঁচানোর জন্য 'জব কিপারস' এ্যালাউন্স দিচ্ছে। এতে মোটা অংকের অর্থ পেয়েছে আহলানের কোম্পানী। ভেবেছিলো দেশে একটা হসপিটাল করবে ওই অর্থ দিয়ে। এখন সে হতাশ হসপিটাল নামের পিশাচের আখড়ার উপর।

দু'দিন পরই আহলান খবরে দেখলো হসপিটালের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলার সূত্রেই হসপিটালের চারজন কর্মকর্তার দেশত্যাগের উপর আদালত নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। নিহতদের পরিবারের জন্য ১৫কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দেওয়ার জন্য হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে মৃতদের পরিবারের সাথে আলোচনায় বসতে বলেছে আদালত ।

আহলান একা ঘরে মাথার টুপি খুলে দেশের সেই সব আইনজীবী, স্বাস্থ্যকর্মী ও পুলিশদের শ্রদ্ধা জানালো যারা করোনার মৃত্যুঝুঁকি পরোয়া না করে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অর্থবিত্ত থাকলে দান খয়রাত করা যায় বটে তবে অতিমারীর সময়ে জীবনপাত করে এমন মহৎ কাজ কয়জনই বা করতে পারে।

মিল গেটে ফারাজ

(করোনার সময়েও খবরের কাগজে খবর হচ্ছে বাংলাদেশে নানা অঞ্চলে বাল্যবিবাহ হয়েই যাচ্ছে সন্ধানী চোখে কিছু রহস্য ধরা দিল)

প্রায় আট সপ্তাহ পর অনেক ঝক্কি ঝামেলা পেরিয়ে রংপুর অঞ্চলের নীলফামারীর প্রত্যন্ত এক গ্রাম থেকে ফারাজ নারায়নগঞ্জের গেঞ্জির কারখানায় পৌঁছেছে। করোনার কারনে মিল বন্ধ ছিল। এক মাসের বেতন হাতে নিয়ে দরাজ ও ফারাজ গ্রামে ফিরেছিল। বেতন খতম অল্পদিনেই। ছোট্ট বোন ফড়িংএর বিয়ের জন্য জমানো টাকাতে বাবার ওষুধ কিনতে ও নিজেদের খাবার কিনতে হাত দিতে হয়েছে।

কখন কারখানায় কাজ শুরু হবে সেই চিন্তায় দুই ভাইয়ের ঘুম যখন হারাম তখন আশা ও আনন্দের উদয়। বোনের বিয়ের আলাপ নিয়ে সামান্য চেনাজানা বিদেশ ফেরত আকমল আসলো। অনেক দই, মিষ্টি নিয়েই সে আলাপ শুরু করলো। ওর বিনয়ী কথায় ফারাজরা মুগ্ধ।

আকমল বললো

-ছেলেটা ভাল, দুবাইয়ের হোটেলে ঝাড়ামোছার কাজ করে ভালই সে রোজগার করে। ফড়িং ফর্সা ও সুন্দরী বলে কোন দাবী দাওয়া ছাড়াই সে বিয়ে করতে আগ্রহী।

দরাজ বলেছিল

-এই দুর্দিনে কোন আয়োজন করাই সম্ভব না, এক হচ্ছে পয়সাও নাই, দুই লোকজন জমায়েত করে নামাজ-জামাত, আনন্দ ফূর্তি সব এখন বারন আছে

-এই জন্যইতো বলছি চুপচাপ কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে রেজিষ্ট্রী করে ফেললেই হবে

-ফড়িংএর যেতে হবে তো?

-লাগবে না, ফড়িং ক্লাস নাইনে পড়ে ও নিজে কাগজে লিখে তোমাকে ক্ষমতা দিয়ে দিবে যাকে পাওয়ার অব এ্যাটর্নী বলে তা দেখলেই কাজী বিয়ে রেজিষ্ট্রী করিয়ে দিবে।

সব শুনে দরাজ ফারাজের বাবার কেমন একটু খটকা লাগলো। মেয়ে এখনো বিয়ের বয়সে পৌঁছায় নি। তবে শান্তশিষ্ট পাত্রটিকে দেখে পছন্দ হয়েছিল বৃদ্ধের। বিশেষ করে খরচের হাত পাত্রের উদার। সবার জন্য কাপড়চোপড়, মিঠাইমন্ডার বহর সবই মনকাড়া। তার মেয়েও গুণবতী সুন্দরী। তাই পাত্রপক্ষ যখন দরিদ্র দরাজদের হাতে ভাল অংকের টাকা গুজে দিল তখন সব 'খটকা' ও 'কিন্তু কিন্তু 'উবে গেল।

ফারাজের বিষয়টা ভাল লাগেনি। ফারাজের বয়স মাত্র উনিশ কি বিশ তারপরও মনে হল পাত্রপক্ষ তাড়াহুড়া করছে, টাকাও দিচ্ছে আবার বিয়েটাও গোপনে সারতে চাইছে। কেন? প্রশ্নটা জোর দিয়ে করতে পারেনি। অভাব, অসুখ ও ক্ষুধার সংসারে টাকাটা বড় দরকার যে।

ভিতরে ভিতরে আশংকা ও আক্রোশে কাঁপছিল ফারাজ।

ভাল পোষাক, আংটি, কানের দুল, লিপস্টিক, ক্রীম, পাউডার সবকিছু দেখে ফড়িং যার সারাজীবন একবারে একটির বেশী জামা জোটে নি কখনো সেই খুশী মনে বিয়েতে রাজী।

পাড়াপড়শীর অগোচরে চুপিচুপি কাজী অফিসে বিয়ের পর সেই রাতেই দরাজ ও ফারাজ সিএনজি নাকি টেম্পোতে করে ফড়িংকে গ্রাম ছাড়িয়ে দূরে এক বাস স্টপেজে জামাইয়ের কাছে দিয়ে আসলো। আকমলও ছিল। দরাজ আকমলের কাছে আস্তে আস্তে জানতে চাইলো

-বাস টাস তো চলে না যাবে কি ভাবে?

-সব্জী নিয়ে ট্রাক ঢাকার পথে যাবে তাতেই লুকিয়ে ওরা উঠে যাবে

-ঢাকায় কেন যাবে?

-আরে যাওয়ার পথে ওদের বাড়ীর কাছে ওরা নেমে যাবে ।

বলেই আকমল আরও কিছু টাকা দরাজের হাতে গুঁজে দিল।

আজ প্রায় একুশ দিন ফড়িং নতুন বরের সাথে চলে গেছে। কোন খবর পায় নি ওরা। উৎকণ্ঠিত পরিবার। কাউকে বলাও যাচ্ছে না কিছু। এর মাঝে হঠাৎ বাবা পড়ে গিয়ে কোমড়ের হাড় ভাঙ্গলো। ছোটখাটো শুকনা পাতলা মায়ের পক্ষে লম্বা চওড়া বাবাকে তোলা, নাড়ানো চাড়ানো সম্ভব নয়। অগত্য ঠিক হল দরাজ বাড়ীতে থেকে যাবে।

দরাজের প্রায় নয় বছরের ছোট ফারাজ ক্লাস নাইনের শেষে ভাইয়ের সাথে গেঞ্জির মিলে কাজে লেগেছে। তাও হয়ে গেছে পাঁচ ছয় বছর। দায়িত্ববান, বুদ্ধিমান লিখতে পড়তে জানা ফারাজ এরই মাঝে মেশিন চালানোতেও দক্ষ। মিলে ওর কদরও বেশী।

মিলে এসে শুনলো এরা এবার গেঞ্জির বদলে ওই কাপড় দিয়ে বিদেশের জন্য মাস্ক বানানোর ফরমায়েস পেয়েছে। করোনার কালে যত তাড়াতাড়ি ফরমায়েসী মাল পাঠাবে ততোই লাভ। করোনা শেষ হলে এ ধরনের কাজ আর পাওয়া যাবে না। মিলে শ্রমিকরা ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা জান লুটিয়ে কাজ করছে। করোনা ওদের চট্ করে মেরে ফেলতে পারে তবে কর্মহীন দরিদ্রজীবন মারার আগে ওদের দেয় লাঞ্চনা গঞ্জনা, অপমান ও ক্ষুধার কষ্ট। কখনো বা দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচতে ওরা সততা হারিয়ে হয়ে উঠে দুঃস্কৃতিকারী।

যদিও মিলের মেশিন ফারাজদের পেশী নিংড়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছে তারপরও কাজ শেষে মজুরী পাচ্ছে এই টুকুই শান্তনা ওদের। কাজ করছে ফারাজ তবে মনটা তার বিষন্ন।

পাশের গ্রামের আদিল চাচাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখের পানি মোছে। এক রাতে কাজের মাঝেই আদিলের জ্বর আসলো। পরদিন কাশি শুরু হল। সেদিন মিল গেট থেকেই তাকে বিদায় করা হল। পরদিনই ফারাজ আদিলচাচাকে অনেক রাতে দেখতে গেল। ভয়ংকর কাহিনী শুনে পালিয়ে আসলো ফারাজ। আকমল আদিল চাচার প্রায় বাচ্চা মেয়েকেও বিয়ের 'সুব্যবস্থা' করে দিয়েছে। চাচা কাঁদতে কাঁদতে বললো - কাগজে পড়ছোনি দুর্দিনে বাল্যবিয়া বাড়ছে! আকমলের সাজা আল্লাহ্ আখেরাতে দিবেন। সে অভাবী ভুখা মানুষের মেয়েদের কোন জাহান্নামে পাঠাচ্ছে কে জানে?

আদিল পরদিন করোনাতেই মারা গেল। আর সেদিনই ফারাজ মিল গেটে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে মারলো।

প্রশ্ন হল কেন? কেন মানুষকে এভাবে মরতে হবে?

বাদল ও হিমেল

বাদল ঢাকার মতিঝিলের ছোট্ট এক ট্রাভেল এজেন্সীতে কাজ করে। করোনা প্রকোপে কাজকর্ম বন্ধ। মেসও বন্ধ। ভয় নিয়ে টাঙ্গাইলে বাড়ী ফেরার আয়োজন। এলাকার অনেক মানুষ তাকে দেখলে ছিড়ে খুঁড়ে ফালা ফালা করবে তা সে নিশ্চিত জানে। সুদিন দেখবে বলে ট্রাভেল এজেন্সীর মালিকের বদান্যতায় ছোটভাই হিমেলকে আমেরিকা পাঠিয়েছে। প্রায় ১৫ থেকে ২০লক্ষ টাকা খরচ করেছে তাতে। সব টাকা শোধ করতে পারেনি। তাই এই এজেন্সীতে রক্ত মুখে তুলে কাজ করে যাচ্ছে বাদল। মালিকটা খারাপ লোক নয়। বিমানের টিকেট বেঁচাই মূল কাজ এই অফিসের। তবে কর্মী ভিসা জোগার করতে পারলে মাঝে সাঝে দু'একজনকে আরবদেশেও পাঠায় ।

বাদলের ভাই অবশ্য লেনদেনের বিনিময়ে মালিকের আত্মীয় এক কূটনীতিকের 'হোম হেলপার' হিসাবে গেছে। কথা হয়েছে কূটনীতিকের বাসায় কাজের পাশাপাশি রন্ধন শৈলী ও হোটেল ম্যানেজমেন্টে ক্লাসও করবে সে। কূটনীতিকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিরাট। চাকরী শেষে হিমেলকে নিয়ে আমেরিকাতে একটা রেস্টুরেন্ট ব্যবসা খোলার ইচ্ছা। হিমেল খুব কাজের ছেলে। সেই মতো হিমেলও আমেরিকার বিদ্যাশিক্ষায় নিজেকে তৈরী করে নিতে প্রস্তুত। তা রন্ধনই হোক বা যাই খুশী তাই হোক।

ভাইকে আমেরিকা পাঠানোর সুবাদে নিজ এলাকায় বাদলের অবস্থান প্রায় বীরের মতো হয়ে গেল। অনেকেই তার কাছে আসা যাওয়া শুরু করে। উদ্দেশ্য আমেরিকা যাওয়ার ফন্দি ফিকির জানতে।

পরিচিত জনদের আব্দার শুনে শুনে একদিন অফিসের মালিককে কথার ছলে বিষয়টা জানালো বাদল। একটু চিন্তা করে মালিক বল্লো

-আমার এক চাইনীজ বন্ধু থাকে আমেরিকায় তার সাথে কথা বলে দেখি কিছু লোককে পাঠানো যায় কিনা।

বাদল চাইনীজ টাইনীজ শুনে ভয় পেল। যারা তার কাছে আসে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ পেতে তারা ধনী নয়, সরল মানুষ এদের কোন বিপদ হোক তা বাদল চায় না।

একদিন মালিক জানালো কিছু লোককে স্টুডেন্ট ভিসায় হয়তো পাঠানো যেতে পারে তবে খরচ অনেক। বাদল বললো

-স্টুডেন্ট ভিসায় যাওয়ার মতো যোগ্যতা ও ক্ষমতা এদের কারোরও নাই

-শোন নামেই ভিসাটা স্টুডেন্ট কাজ করবে তো ওই চাইনীজের ফ্যাক্টরীতে মজুরের

-ধরা পড়লে কি উপায় হবে?

-ধরা পড়বেই না, ওদেরকে দিনে বেইজমেন্টে লুকিয়ে রাখবে আর রাত্রে কাজ করাবে; কাকপক্ষীও জানবে না ওদের কথা।
ব্যথিত বাদলের বিস্মিত জিজ্ঞাসা
-শ্রমিক না শ্রমদাস হয়ে থাকতে হবে?
-তাই থাকতে হবে; ওরাতো হোয়াইট হাউসে গিয়ে উঠতে পারবে না।
নিজের ভাইয়ের বিদেশ যাওয়াতেই বাদল শংকিত। কত কাজ ভাইটাকে করতে হয়। কি খায়. পড়াশুনাই বা কখন করে এসব ভেবে বাদলের মন কেমন করে উঠে। তাও ভাল যে বাংলাদেশের একজনের সাথে আছে। ভাত তো খেতে পায়। ইদানীং টাকা পয়সাও পাঠাতে শুরু করেছে। মা-বাবা খুশী, আত্মীয়স্বজনও খুশী। পাড়াপড়শীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে বাদলদের ভাগ্য দেখে। বাদল জানে কি কষ্ট ওর ভাই করছে ওখানে। তবে এইটুকুই শান্তি যে বেআইনী ভাবে যায়নি যে ওকে বের কর দেবে বা পুলিশে ধরবে।
সবার আব্দার আকুতিতে দিশেহারা হয়ে এজেন্সীর মালিককে আবার বল্লো বাদল। মালিক লোকটি খারাপ না সে বল্লো যে যারা ২০/২৫লাখ টাকা খরচ করতে পারবে তাদেরকে সব সত্যি খোলাখোলি বলবে। সত্যি শোনার পরও যদি তারা রাজী হয় তবেই কাজ শুরু করা যাবে। বাদল গোপনে বসে জনাকতক আগ্রহী লোককে 'আমেরিকা অভিযানের' বিষয়ে ভালমন্দ সব বুঝিয়ে বললো। সব শুনেও তাদের মাঝে কয় জন যাওয়ার জন্য মরিয়া। শুধু প্রশ্ন ছিল তারা যে ওই চাইনীজের জন্য কাজ করবে বেতন টেতন পাবে তো? আর বেতন পেলে তা দেশে কিভাবে পাঠাবে?

বাদল দেখলো গরীব মানুষগুলো কি কঠিন পরিবেশে প্রায় বন্দী থেকে কাজ করবে তা নিয়ে ভয় পাচ্ছে না মোটে। তাদের চিন্তা দেশে স্বজনদের কি ভাবে টাকা পাঠাবে। গরীবরাই তাদের বিদেশের কামাই অনবরত দেশে পাঠায় এটা শুনেছে এখন তা দেখছেও বাদল।
মালিক জানালো টাকা পাঠাতে পারবে এবং এই ট্রাভেল এজেন্সীই দায়িত্ব নিয়ে তাদের টাকা পয়সা বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দেবে। কথা হল প্রথমতঃ তারা তিন লাখ টাকা করে জমা দেবে। ট্রাভেল এজেন্সীর প্যাডে তাদের রশিদও দেওয়া হবে। কোন কারনে যাওয়া বাতিল হলে টাকা তাদের ফেরত দেওয়া হবে।
মালিকের উপর আস্থা ও বাদলের আশ্বাসে ১২জন মানুষ একে একে ৩লাখ করে টাকা দিয়ে গেল। মালিক আমেরিকাবাসী চাইনিজের সাথে মাঝে মাঝেই কথাবার্তা বলে যাচ্ছে। এরমাঝে শুরু হল পৃথিবী জুড়ে করোনার ত্রাস। আমেরিকা যাওয়াটা বোধহয় স্বপ্ন হয়েই থেকে যাবে ভাবছে ওই বারো জন মানুষ। তখনই আরেক আতংকের খবর। লিবিয়াতে ত্রিশজন মানুষকে এক আদম বেপারী গুলি করে হত্যা করেছে। তাদের মাঝে ছাব্বিশজন হতভাগাই হচ্ছে বাংলাদেশী। এরা বিদেশে যাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আদম বেপারীদের দিয়েছিল। খবর শুনে বারোজন মানুষই বিদেশ যাওয়া বাদ দিয়ে টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য দেনদরবার শুরু করলো।
এর মাঝে জ্বর কাশি নিয়ে টাভেল এজেন্সীর মালিক অফিস চালাতে পারছিল না আর। করোনার কারনে এ্যারোপ্লেন চলাচল বন্ধ। অগত্য অফিস বন্ধ করতে হল।
বাদলও বিপদে। অফিসের চাবির গোছা বাদলের কাছে। মালিকের করোনা হয়েছে কিনা ভেবে বাদল চিন্তিত ও ভীত।
হঠাৎ বাদলের মনে হল মালিককে চাবিটা দিয়ে যেতেই হবে। ফোন করে বাসার ঠিকানা চাইতেই দূর্বল গলায় মালিক বললো
-না, না, তোমায় আসতে হবে না বাদল। তুমি একটা কাজ কর আয়রন সেফ খুলে তাতে ছয়টা কাপড়ের পুটুলী আছে তা তুমি বাড়ী নিয়ে যাও। তাতে কি আছে তুমি জান।
-আমি এগুলো নিয়ে কি করবো?
-কি করতে হবে তুমিই ঠিক করো। আমি করোনায় মরতে বসেছি আর বেশী কিছু বলতে পারবো না। শোন আমি বড় কোন অন্যায় জীবনে কখনোই করিনি আর করতেও চাইনা।
বলেই লোকটি লাইন কেটে দিল।
বাদল অফিসে এসে পুটুলীগুলি পেল। খুব সাবধানে সেগুলো সামলে নিয়ে সে বাড়ীর পথ ধরলো। এখন যত তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছাতে পারবে ততই মঙ্গল। কি করবে টাকাগুলো? তার রুজী রোজগারহীন এই দুঃসময়ে নিজেই রেখে দেবে নাকি ওই বারো জন যারা বড় আশা করে বসে আছে; তাদের অনেক কষ্টের ধন তাদের হাতে তুলে দেবে? বুঝতে পারছে না বাদল কি করলে ভাল লাগবে, মনে শান্তি পাবে।
রাস্তাঘাটে বাস গাড়ী নাইই প্রায়। স্কুটার ভাড়া করে রওয়ানা হল। লুঙ্গি গেঞ্জির বেশবাসে বাদলকে দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না যে সে লক্ষ লক্ষ টাকা পুরানো শান্তিনিকেতনী ঝুলিতে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে।
স্কুটারে বসে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হল যখন তখনি অন্ধকারে কান্না জড়িত ভাইয়ের গলা সে শুনলো
-আমার শরীরটা ভাল না ভাই।
-কি হয়েছে রে
-জানি না, ডাক্তারের কাছেও যেতে পারছি না, দোয়া কর, দোয়া কর ভাই।
তন্দ্রা টুটে গেল। চলন্ত স্কুটারে বসে বাদল অসহায় ভাবে টাকার থলে আকঁড়ে ধরে ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে। টাকাগুলো সে মানুষদের হাতে তুলে দিতে পারবে তো, তার ভাই হিমেল আমেরিকা থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে তো?